

## ইসির সঙ্গে কথাবার্তা

মনজুরে মওলা

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গত ক’দিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা চলছে। নির্বাচন কমিশন যে সব দলকে না ডেকে কয়েকটি মাত্র দলকে ডেকেছে, তা এইজন্য করেছে যে, এমনটি করা ছাড়া কমিশনের কোনও গতান্তর নেই। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন নির্বাচন কমিশন ঠিক দলটিকে ডেকেছে কিনা, তা নিয়ে কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং কেউ কেউ নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

নির্বাচন কমিশন যেসব মতামত পাচ্ছে, সেগুলো বিবেচনা করে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কমিশনের মতে গ্রহণযোগ্য সেগুলো গ্রহণ করে একটি সমন্বিত রূপরেখা কমিশনকে তৈরি করতে হবে। এ রূপরেখা কেবল নির্বাচন কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই চলবে না, তা দেশের মানুষের কাছে এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাছে, পুরোপুরি না হোক, ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সেটি যদি না হয়, তাহলে কোন কোন রাজনৈতিক দল হয়ত এ রূপরেখার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত নাও হতে পারে। তেমনটি যদি হয়, তাহলে জটিলতা সৃষ্টি হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অসম্মত দলটি, বা, দলগুলো যদি দেশের কোন প্রধান রাজনৈতিক দল, বা জোট হয়, তাহলে গত বছরের শেষ দিকে নির্বাচন নিয়ে যে ভীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তা পুনরাবৃত্তি হবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সুতরাং, নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক হতে হবে।

আমার যতদূর মনে পড়ে, একটি দল নির্বাচন কমিশনকে বলেছে, নির্বাচনের সময় স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স থাকা ওই দল অত্যাবশ্যকীয় মনে করে না। এর আগে নির্বাচন কমিশন থেকেও একই ধরনের মত প্রকাশ করা হয়েছিল বলে কোন কোন খবরের কাগজ থেকে দেখা যায়। কমিশন অবশ্য বলেছিল যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, সেটি হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর। অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার সময় এ বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে, এমন খবর আমার চোখে পড়েনি। তাহলে কি বিষয়টি চাপা পড়ে গেল? এমনটি হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় হবে না। গত জাতীয় সংসদের প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দল এবং সংসদের বাইরের বহু রাজনৈতিক দল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দাবি করে এসেছে— বলেছে, নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। এ সব দল এ দাবি থেকে সরে এসেছে বলে আমার জানা নেই। নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের কিছু কিছু নমুনাও পরীক্ষা করে দেখেছে বলে খবর বেরিয়েছে। কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ করার কথা বলেছে। হ্যাঁ, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স যদি দেশেই তৈরি করা হয়, তাহলে তা তৈরি করতে খরচ একটু বেশি হবে। কিন্তু তাতে কী? নির্বাচনে স্বচ্ছতা বিধান করা এবং সে বিষয়ে জনমানুষের মনে প্রতীতি জন্মানোই বড়ো কথা— এটি করতে গিয়ে বাড়তি কত টাকা খরচ হলো, তা নয়। মনে করা যেতে পারে, বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অব্যবহিত আগের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিদ্যমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার বদলে নিজের খেয়ালখুশিমতো নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে কমিশনের প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার মতো ব্যয় করেছিলেন। আর স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স তৈরি করার মতো যথেষ্ট সময় এখনও হাতে আছে।

আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যুদ্ধাপরাধীরা যাতে অংশ নিতে না পারে, অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে এ দাবি জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ‘অনভিপ্রত’। সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত যে আলোচনা সভায় প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেছেন, সে সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন দু’জন সাংবাদিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন যে, প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলার পর যোগ করেছেন যে, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত। আমি যে খবর কাগজে প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্যটি দেখেছি, সেখানে এ কথাটির উল্লেখ ছিল না। এটি প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত মত, এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে, এটি সরকারের মত নয়, কিংবা, সরকার এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসেনি। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারুক, এমনটি নির্বাচন কমিশনও নীতিগতভাবে চায়, কিন্তু এ বিষয়ে ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।

মৌলবাদী বলে পরিচিত একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ওই দলটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং ওই দলের কারও কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আছে বলে শোনা যায়। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করার পর ওই দলের নেতা বলেছেন যে, বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই এবং আগেও ছিল না। প্রকৃত ঘটনা যে কী এবং সত্য যে কী, তা কারও অজানা নয় এবং ওই নেতারও অজানা থাকার কথা নয়। বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, এ কথা ওই নেতা কিসের জোরে বললেন?

যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা হয়নি, আদালতে তাদের দোষ প্রমাণিত হয়নি, আদালত তাদের দণ্ড দেয়নি, এ কারণে যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া সূচনা করতে হবে এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এত দিন পর্যন্ত রাষ্ট্র তার এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। এখন আর দেরি করার কোন সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশনের হাতে এমন ক্ষমতা না থাকতে পারে, যা প্রয়োগ করে কমিশন আগামী নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু আদালতে কেউ যদি নৈতিক স্বলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং আদালত কর্তৃক অনূন দু’বছর কারাদাণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহলে সে সংবিধানের ৬৬(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পাঁচ বছর সময় পার না হওয়া পর্যন্ত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারে না— ফলে, সাধারণ নির্বাচনে কিংবা জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি আদালতে দ্রুত আনীত হয় এবং সে অভিযোগের বিচার যদি দ্রুত সম্পন্ন হয়, তাহলে যুদ্ধাপরাধীরা আপনা থেকেই নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশ নেয়ার অযোগ্য হয়ে পড়বে, অবশ্য যদি তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়। এ অপরাধ যাতে সন্দেহাতীত প্রমাণিত হতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এটি করা অসম্ভব কিছু নয়। যুদ্ধাপরাধীদের হাতে নির্যাতিত হাজারও মানুষ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে নিয়ে বসে আছে।

[লেখক কবি, কলামিস্ট ও সাবেক সচিব]

## যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

কর্নেল (অব) মোঃ গোলাম মোস্তফা

বাংলা পরিভাষায় সংযোজিত হয়েছে বিশ্বের জঘন্যতম গালি রাজাকার। নিজামী-মুজাহিদরা যারা এ শব্দটাকে ধারণ করে বাংলার মাটিতে এখনো বেঁচে আছে, তাদেরও এ গালি দিলে হকচকিয়ে যায়, আঁতে ঘাঁ লাগে এবং নড়েচড়ে বসে এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করে কেউ তা দেখে ফেলল কিনা বা শুনে ফেলল কিনা। এ গালি নেতিবাচক ত্বরিত সঞ্চালক, আত্মসম্মানে ধাক্কা দেয়। রাজাকার মানেই স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার মানেই স্বাধীনতার শত্রু যুদ্ধাপরাধী। এটা বাংলার মানুষের

সবারই জানা। নিজামী-মুজাহিদদের এ নামে ডাক দিলে ঘৃণার বিচ্ছুরণ ঘটে, ক্রোধ নিবারিত হয় এবং একটা অনাবিল তৃপ্তির বিকাশ ঘটিয়ে তা দেহমানে গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে মধুরাবেশে দোলা দেয়। সাদামাটা কথায়— ভাল লাগে। লাগবে না কেন? ওরা '৭১-এ যা করেছে তা বিশ্বের কুৎসিততম। ওরা এখনও তা-ই করতে চায়। ওদের আছে সেই আগের মতোই মিথ্যাচার আর ব্যাভিচার। কথায় কথায় মুজাহিদ বলে যে '৭১-এ ওরা ছাত্র ছিল। কি বোঝাতে চায় ও; এ কথা বলে? তার মানে ও কি তখন ছাত্র ছিল— প্রাইমারী স্কুলের? ও তো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওর বয়সে অনেকেই তখন হানাদার সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, মেজর। ও কি বলতে চায় যে ঐ বয়সে ওর রাজাকারী করবার সময় হয়নি? ফরিদপুর শহরের অনেকেই জানে যে এই সেই মুজাহিদ যে অতি ইসলামী কাঠমোল্লা এবং মাদ্রাসার ধর্মাক্ষ ছাত্রদের নিয়ে ফরিদপুর শহরের কমলাপুরে অবস্থিত আনসার ক্যাম্পে '৭১ সালে ব্যাচে ব্যাচে রাজাকার আল বদর ট্রেনিং দিয়ে হানাদার বাহিনীর সাহায্য সহযোগিতায় যোগান দিয়েছে। এক এক ব্যাচে ২/৩শ' জন করে ট্রেনিং নিয়েছে। স্থানীয় ফায়ারিং রেঞ্জে ওদের ফায়ারিং করানো হয়েছে। আর এ জন্য হানাদার সেনারা আনসারের হাতিয়ার ও গোলাবারুদ ওদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ফরিদপুরে হানাদারেরা প্রবেশ করে ১২ এপ্রিল আর মুজাহিদ নিজ উদ্যোগে এই ট্রেনিং শুরু করে জুন মাস থেকে। মাসে মাসে একটা ব্যাচ করে ট্রেনিং। তখন মুজাহিদের সহযোগী ছিল নগরকান্দা নিবাসী মৌলানা(?) আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকার। বাচ্চু রাজাকার তখন নাট্য ব্যক্তিত্ব পীযুষ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি দখল করে বসবাস করত। ওদের সঙ্গে আরও ছিল ঝিলটুলীর ঝিনু (মরে গেছে)। নিয়োগপ্রাপ্ত রাজাকার আল বদররা ছিল সরকারী বেতনভুক্ত। এসব কথা শহরের অনেকেরই জানা। মুজাহিদের বাড়ি ছিল শহরের খাবাশপুরে। ও কোন মজুব মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেনি। স্থানীয় জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেছে। ওর বাবা ছিলেন মৌলানা আবদুল আলী সাহেব, চকবাজার মসজিদের তখনকার ইমাম। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শহরের সকলে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর এই জনপ্রিয়তা দেখে হানাদারেরা তাঁকে শান্তি কমিটিতে যোগদান করতে বলে। হানাদারদের সব অন্যায় কাজের সহযোগী হতে তিনি অস্বীকার করলে ওরা তাঁকে মেরে ফেলবার হুমকি দেয়। তখন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে এই বলে ঐ কমিটিতে যোগদান করতে অনুরোধ করেন যে, ওখান থেকে তিনি হয়ত রাজাকার আর হানাদারদের অনেক অন্যায় অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারবেন। হানাদার বাহিনীর এবং নিজের ছেলে মুজাহিদ বাহিনীর সকল অন্যায়ের দায়দায়িত্ব নিয়ে তিনি এ দেশে থাকতে চান নি। সে বছরই তিনি হজে গমন করেন এবং যাবার সময় সবার কাছে এই বলে দোয়া চান যেন তাঁকে আর এদের মাঝে ফিরে আসতে না হয়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন এবং তিনি সৌদি আরবেই মৃত্যুবরণ করেন। এই লোকের ছেলে হলো মুজাহিদ। সে বর্তমানে এ দেশের জামায়াতের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ধর্মের কথা বলে। ওকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ও সব সময় কেন টুপি পরে থাকে না। উত্তরে সে বলেছিল যে, সে কোন মৌলানা নয়, আর তাছাড়া লোকে তাকে তালেবান বলবে এ জন্য সে টুপি পরে না। এই হলো তার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মশ্রদ্ধা। মজ্জাগতভাবে গোড়া ধর্মাক্ষ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা সব সময় সব জায়গায় কিছু না কিছু সংখ্যক থাকেই। ওদের নিয়েই মুজাহিদ যাত্রা শুরু করেছিল। রাজাকার আল বদরদের ট্রেনিং প্রদানের পাশাপাশি লুট, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, দখল ইত্যাদি অন্যায় কাজে মুজাহিদ হানাদারদের নবেশ্বর '৭১ পর্যন্ত সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যায়। এর পর সে ঢাকায় চলে আসে। '৭২-এর পর এমএ পরীক্ষা দিয়ে মুজাহিদ আর্থিক সাহায্যে গড়ে ওঠা রহস্যজনক 'ফয়সাল একাডেমীতে' অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর পর '৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত মুজাহিদ-বাচ্চু রাজাকারেরা চুপ থাকে। কিন্তু '৭৫-এর ডিসেম্বরে জিয়া দালাল আইন বাতিল করলে ওরা স্বমূর্তিতে আবার ফিরে আসে। ইসলামী ছাত্র সংঘ এবং পরবর্তীতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের দায়িত্ব নিয়ে মুজাহিদ দলীয় ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনী রগ কাটা অভিযান পরিচালনা করে প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ কাজে তখনকার প্রশাসন সরকারীভাবে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। ত্রাসের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের সফলতার ধারাবাহিকতায় পুরস্কারস্বরূপ মুজাহিদকে জামায়াতের জেনারেল সেক্রেটারি করা হয়। '৭৫-এর ডিসেম্বরে দালাল আইন বাতিল এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়াটাই ছিল রাজাকার এবং জামায়াতীদের জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। বর্তমানে ওরা নাকি মিসরের সাইদ কুতুব আহমেদ কুতুবদের মতো সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে। তারই ভূমিকাস্বরূপ ওরা জানান দিয়ে ঘোষণা দেয় যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল গণযুদ্ধ অর্থাৎ উদ্দেশ্যবিহীন কেওয়াস, হটগোল এবং আমাদের স্বাধীনতা হলো নারীলিঙ্গা এবং ভারতের দালালীর ফসল। অর্থাৎ তাদের ভাষায় আমাদের স্বাধীনতা হলো অনৈতিক বিচ্ছিন্নতা। তাই মুক্তিযোদ্ধা বলে কিছু নেই। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বা অপরাধী বলেও কেই নেই। কত বড় ঔদ্ধত্য! এটা দেশকে অস্বীকার করা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে টিটকারি দেয়া। সরকারের কাছে প্রশ্ন এ কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়? এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা সরকারের কি দায়িত্ব নয়? সরকারের বক্তব্য যা-ই হোক, এখন সময় এসেছে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-স্বাধীনতা চেতনা রক্ষার সংগ্রামের। ওরা বঙ্গবন্ধুর ক্ষমার মাহাত্ম্য বুঝতে চায় নি। সে সুযোগকে ওরা অবজ্ঞা করেছে, অবহেলা করেছে। তাই ওদের প্রতি সে সময় যে করুণা করা হয়েছিল, সময় এসেছে তা প্রত্যাহার করবার। ওরা সকলেই যুদ্ধাপরাধী। ওদের সবার বিচার এদেশের মাটিতে করতেই হবে। সরকারকেই তা করতে হবে। কারণ দায়িত্বটা সরকারেরই।

ওদের বিচারের পথ অতীতে রুদ্ধ করা, ওদের এদেশে পুনর্বাসন করা, ওদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ করে দেয়া, দালাল আইন বাতিল, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদান— এ সবার প্রতিফল হলো রাজাকারদের আজকের এই আশ্ফালন, এই ঔদ্ধত্য। আর এ জন্য মূলত জেনারেল জিয়াই দায়ী। কিন্তু পরোক্ষভাবে আমরা মুক্তিযোদ্ধারাও এর জন্য কম দায়ী নই। আমরা আমাদের মৌলিক পরিচিতি, মৌলিক সত্তা-চেতনার সঙ্গে বেইমানি করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার অভিপ্রায়ে দলাদলি করে নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছি। আমরা জিয়া-এরশাদ-খালেদাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সরকারের সঙ্গে আঁট বেঁধে জিয়ার নেয়া মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কার্যক্রম ও পদক্ষেপগুলোকে শুধু সমর্থনই করি নি, তা বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছি এবং এখনও করছি। আর এই ভুলের সুযোগ নিয়েই রাজাকারেরা আমাদের 'পিচ মিলে' বধ করেই যাচ্ছে। খালেদ মোশাররফ, মঞ্জুর, তাহের, হায়দার, আইভি রহমান, আহসান উল্লাহ মাস্টার, কিবরিয়া সাহেবদের মতো অসংখ্য রত্ন মুক্তিযোদ্ধারা এক এক করে নিহতই হচ্ছেন। যা হোক, এখন সময় এসেছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার। কারণ আজ আমাদের অস্তিত্বের ওপর আঘাত এসেছে। প্রয়োজন পড়েছে পাল্টা আঘাত হানবার। একই সঙ্গে সরকার থেকে শুরু করে সকল সরকারী-আধাসরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সকল পেশার সংগঠন-সমিতি-প্লাটফর্ম, সকল রাজনৈতিক দল/সংগঠন, সমাজের সকল পেশার সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ অঙ্গীকার করতে হবে বা ঘোষণা দিতে হবে যে, তারা আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-সংবিধান এবং পতাকা নিয়ে গর্বিত কিনা, আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় বিশ্বাস করে কিনা, স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী-রাজাকার, দালাল, খুন-ধর্ষণ-লুটতরাজকারী অপরাধীদের বিচারদাবিকরে কিনা, আমাদের '৭২-এর সংবিধানের পুনরুদ্ধারের পক্ষপাতী কিনা, দেশের সকল স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, হানাদার বাহিনীর দালাল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের নিমন্ত্রণ না করবার পক্ষে কিনা বা ঐ সব অনুষ্ঠানে ওদের নিমন্ত্রণ জানানো হলে তা বর্জন করবার পক্ষে কি না। এ সকল প্রশ্নই আজ মৌলিক প্রশ্ন এবং এ সব প্রশ্নের মাঝামাঝি থাকবার কোন অবকাশ নেই, যেমনটা সামরিক বাহিনীতে ঘটে যাওয়া মিউটিনির মতো- হয় পক্ষে থেকে তা সমর্থন করা,

নয়ত বিপক্ষে থেকে তা প্রতিহত করা। মাঝামাঝি বলে সেখানে কিছু নেই। এখানেও ঠিক তাই— সকলকে পক্ষে বা বিপক্ষে ঘোষণা, সমর্থন, অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি দিতেই হবে। অনেকে অভিযোগ করে বলেন যে, গত ৩৬ বছরের সরকারগুলো যা করেনি তা এখন কেন করতে হবে? বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে এখন কেন তাদের বিচার চায়? প্রথমত, এত বছর যে কারণেই হোক ওদের বিচার করা হয়নি। সেই অজুহাতে এখন বিচার না-করা কি সঠিক বিচার হলো? দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ বাদে ৩৬ বছরের মধ্যে জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকারগুলো রাজত্ব করেছে ২৭ বছর। ওরা সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, রাজাকারপুষ্টি এবং রাজাকার পৃষ্ঠপোষক সরকার। তারা ছিল এই বিচারের বিরোধী। ওদের দ্বারা সংবিধান পরিবর্তন এবং দালাল আইন বাতিল তারই প্রমাণ বহন করে। তাই ঢালাওভাবে ৩৬ বছরের কথা বলাটা ঠিক নয়। অনেকে আবার বিষয়টাকে এখন ভীষণ জটিল বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এটা নিয়ে এখন কথা বলা ঠিক নয়। এ ধরনের বক্তব্য অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করা বই কিছু নয়। এ ব্যাপারটি আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্ব সংক্রান্ত ব্যাপার। এটা যতই জটিল হোক না কেন তার নিষ্পত্তি করতেই হবে। শরীরের ক্যান্সারের চিকিৎসা না করলে তা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতরই হয়ে অবশেষে মৃত্যু ডেকে আনে। আমরা তেমনটা মোটেও কামনা করি না। রাজাকারদের হয়ে এ ধরনের কথাবার্তা না বলাই উচিত। বিষয়টি পরিষ্কার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতেই হবে, দ্রুত এবং যারা দেশ চালায় সেই সরকারকেই করতে হবে। তারা অন্তত গুরুটা করে দিয়ে যাক। এর জন্য সময় লাগে না। বিভিন্ন টিভি মিডিয়ার কাছে অনুরোধ তারা যেন সবার ঘোষণা-অঙ্গীকার-স্বীকারোক্তি ক্যামেরায় ধারণ করে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করে। সেখানে কারও পাশ কাটানোর সুযোগ যেন না থাকে। দেশের স্বার্থেই এটা তাদের জন্য পবিত্র দায়িত্ব।

নতুন প্রজন্মের কাছে আবেদন—আমরা তোমাদের জন্য একটা ভূখণ্ড দিয়েছি, তার স্বাধীনতা দিয়েছি, নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতির জন্য একটা পতাকা দিয়েছি। আরও অনেক কিছু দেবার ছিল, করবার ছিল, পারিনি। এটা এক বাস্তবতা এবং স্বীকার করি যে, এই ব্যর্থতা আমাদের। সেই ব্যর্থতার অজুহাতে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পার না। সেই '৭১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত অনেকটা সময় তোমরা আমাদেরকে সামনে রেখে পার করে দিয়েছ। এখন তোমাদের দায়িত্ব নেবার পালা। এদেশের ইতিহাস তোমাদের নিজেদের ইতিহাস। তোমাদেরই এর সঠিকতা খুঁজে বের করতে হবে। তোমাদের শেকড়ের ইতিহাস তোমাদেরই উদঘাটন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন ভূখণ্ড, মুক্ত আকাশ—এ সব যদি তোমাদের গর্ব এবং সম্মানবোধ থেকে থাকে তাহলে তার চেতনাকে ধারণ করেই তোমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। আর বিরোধী শক্তিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে অগ্রগামী ভূমিকা তোমাদেরই পালন করতে হবে। আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ হয়েই তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী ওরা সে রকমটাই চায়। অবশেষে নিতান্তই কিছু আবেগের কথা জানাতে চাই। ঘরে সাপ ঢুকলে তা বিষধর কি বিষধর না সে প্রশ্ন অবান্তর। তখন বিষ দাঁত নিরীক্ষা করবার কোন অবকাশ থাকে না। সাপ সাপই, বিষধর ভেবেই তাকে মারতেই হয়। তেমনি গৃহপালিত কোন জন্তু যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে ক্ষ্যাপা জানোয়ার বলে তাকেও মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উত্থাপিত দাবির প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশে অবাস্তব হবার আতঙ্কে দিশেহারা। ওরা সাপ। ওরা ক্ষেপেছে। ওদের মারতেই হবে। জাহানারা ইমাম সে রায় দিয়ে গেছেন কিন্তু তার মৃত্যুঘণ্টা বাজাতে তিনি পারেননি। তার আগেই খালেদা জিয়ার সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করে সে ঘণ্টা বাজানো রহিত করেছে। আমি না হয় তাঁর হয়ে এতদ্বারা সে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সামরিক

কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা]



ফজলুল বারী, সিডনি থেকে

## পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হাওয়ার্ড না কেবিন রাড?

গত ২৮ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ঘড়ির সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থা চলবে আগামী মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। সামারে এখানে দিন অনেক লম্বা হয়ে যায়। বিশাল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে সূর্য ডুবতে ডুবতে বেজে যায় আটটা। এ কারণে প্রতিবছর সামার গুরুত্ব আগমুহূর্তে এভাবে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়া হয়। ঘড়ির কাঁটা এভাবে এগিয়ে নেয়া নিয়ে রেডিও-টিভি, মিডিয়ায় আগেভাগে নানা প্রচার চলে। সে কারণে সবার একটি প্রস্তুতি থাকে। আবার এসব প্রচারণা খেয়াল না করলে অনেকেরই সময় নিয়ে নানা বিপত্তির ঘটনা ঘটে। যেমন ঘটেছে আমার ক্ষেত্রেও। সকালে ডাক্তার দেখাতে ট্রেনে করে ব্যাংকস টাউন স্টেশনে এসে নেমেছি। প্যাথলজি পরীক্ষার জন্য না খেয়ে আসতে বলেছে ডাক্তার। ট্রেন থেকে নামতে নামতে স্টেশনের ঘড়িতে দেখি এগারোটা বাজে। আমার হাতের ঘড়িতে দশটা। ঘড়ি স্লো বা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি সব ঠিক আছে। ডাক্তারের রিসেপশনিস্ট ভিয়েতনামী মেয়েটি আমাকে দেখেই হাসে। সে জানে আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দশটায়। বলল তুমি মনে হয় ঘড়ি ঠিক করে নাওনি। নতুন একটি সময় দিয়ে আমাকে বসতে বলে মেয়েটি। অস্ট্রেলিয়ার ঘড়িতে এভাবে এগিয়ে দেয়াতে আমার অবশ্য সুবিধাই হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আগে সময়ের ব্যবধান ছিল চার ঘণ্টা। এখন সেটি পাঁচ ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের সকাল সাতটা মানে এখানে এখন দুপুর একটা।

### নির্বাচন শুধু মিডিয়ায়

আগামী ২৪ নবেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে নির্বাচনে প্রার্থী। তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী লেবার পার্টির নেতা কেবিন রাড। এখন পর্যন্ত যত জনমত জরিপ চলছে এর প্রতিটিতেই এগিয়ে আছেন কেবিন রাড। এমনকি লিবারেল কোয়ালিশন পার্টির সমর্থক পত্রিকা দ্য অস্ট্রেলিয়ানের জনমত জরিপেও এমন আভাস দেয়া হচ্ছে। এর থেকে ধারণা করা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ভোটাররা একই নেতৃত্বের অধীনে চলতে চলতে ক্লান্ত। তাঁরা এখন

পরিবর্তন চাইছেন। হাওয়ার্ড জমানায় ট্যাক্সের ভারে ন্যূজও অস্ট্রেলিয়ান জনগোষ্ঠী। এখানে মানুষজন সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাগলের মতো কাজ করেন। জীবনযাপনের স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করতে অনেকে একাধিক চাকরি বা কাজও করেন। কিন্তু ট্যাক্সের অনেকটা খেয়ে ফেলে। এদেশে যার যত বেশি আয় তার তত বেশি ট্যাক্স। আয় যার কম বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাদের এসব ট্যাক্স নিয়ে মাথাব্যথা তেমন নেই। এরা মূলত সামাজিক নিরাপত্তার সেন্টার লিস্কের টাকায় চলেন। কল্যাণ রাষ্ট্রটিতে অন্তত একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা করে রেখেছে সরকার। তা হলো কারও কাজ না থাকলে বা কাজ করতে অসমর্থ হলে তার অন্তত পরিবার নিয়ে না খেয়ে মরার কোন সুযোগ নেই।

এখানকার ভোটের জনমত জরিপগুলোর প্রশ্নে মজার কিছু দিক আছে। তা হলো প্রধানমন্ত্রী কতটা সফল এমন প্রশ্নের পাশাপাশি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে কেবিন রাড কতটা সফল বা ব্যর্থ সে প্রশ্নটিও রাখা হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে প্রধান দুই দলের পারফরমেন্স জরিপে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের জরিপে দেখানো হয়েছে ৫৪ ভাগ ভোটের লেবার পার্টির, ৪৬ ভাগ লিবারেল ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশনের পক্ষে মত দিয়েছে। আরেকটি মজার দিক হলো এই যে, একটি দেশে ক্ষমতার পালাবদলের নির্বাচন সামনে এখানকার পথেঘাটের চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের মতো দেয়াল লিখন বা পোস্টার-লিফলেটের প্রতিযোগিতা এখানে নেই। কদাচিত হয়ত কোথাও কোন প্রার্থীর ছবিসহ প্ল্যাকার্ডের দেখা মিলবে। প্রচারণার প্রায় সবকিছুই চলছে মিডিয়াকেন্দ্রিক। টেলিভিশন বিতর্ক আর পত্রিকার পাতায়। আবার পত্রিকাগুলোতে নির্বাচন নিয়ে এখনও মাতম বলতে যা বোঝায় তা নেই। বেশিরভাগ পত্রিকাতে এখন ভিতরের কয়েক পৃষ্ঠাজুড়ে নির্বাচনের খবর ছাপা হচ্ছে।

## এক মায়ের অভিবাসন স্বপ্ন

আরেকটি ফোনের গল্প। ঢাকা থেকে ফোন করেছেন একজন মা। তাঁর ছেলে থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। আরেক ছেলে, স্বামীসহ তিনি ঢাকায় নিজের বাড়িতে থাকেন। এখন অস্ট্রেলিয়ার ছেলে ঢাকার বাড়ির পাততাড়ি গুটিয়ে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চায়। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা। চাকরিজীবন শেষে ঋণ নিয়ে একটি বাড়ি তুলেছেন। এখন প্রতি মাসে বাড়িভাড়ার টাকা থেকে ঋণের কিস্তি শোধ দিতে হয়। ভদ্রমহিলা পরামর্শ চেয়েছেন, ছেলের কথায় ঢাকার বাড়ির পাততাড়ি গুটিয়ে অস্ট্রেলিয়া রওনা হবেন কিনা। সরাসরি তাঁকে ‘না’ বলে দিয়েছি।

কারণ গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় ধারণা হয়েছে, বিদেশে প্রতিষ্ঠা অথবা নতুন সংসার পাতার একটি বয়স আছে। আজকে বাংলাদেশের যে সব ছাত্র পড়াশোনার জন্য অস্ট্রেলিয়া আসছেন তাঁদের গড় বয়স পঁচিশ। এই বয়সের একজন যুবার যে কোন নতুন যাত্রা অথবা এ্যাডভেঞ্চার মানায়। সেটি চল্লিশ বা পঞ্চাশোর্ধদের ক্ষেত্রে অনেক কঠিন। এর বড় একটি কারণ, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই কাজ করে খেতে হয়। এবং এখানকার কাজ খুব কঠিন। আট ঘণ্টা মানে আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টার মাঝে যদি খাবার বা নাস্তার জন্য আধা ঘণ্টার বিরতি দেয়া হয় তাহলে মজুরি দেয়া হয় সাড়ে সাত ঘণ্টার। এই সাড়ে সাত ঘণ্টার পুরোটা সময় নির্ধারিত কাজটি নিরবচ্ছিন্ন করে যেতে হয়। আমাদের দেশে যেমন ৯টা ৫টা বা ৯টা ৪টা অফিস সময়ের কাজের ফাঁকে নামাজসহ নানান বিরতির রেওয়াজ আছে, অস্ট্রেলিয়ায় এর সুযোগ নেই।

তাছাড়া আমাদের দেশের চল্লিশ বা পঞ্চাশোর্ধ একজন মানুষের নিজের জীবনের একটি নিজস্ব ছক তৈরি করা হয়ে যায়। আমাদের দেশের চল্লিশ বা পঞ্চাশোর্ধ একজন মা বা বাবা ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিসহ পরিজন নিয়ে যে মূল্যবোধ আর অভ্যাসে অভ্যস্ত চলেন। তাঁকে হঠাৎ দেশান্তরী হয়ে নতুন নিয়মের জীবনসূচী সাজাতে বলা বোধকরি সুবিচেনা প্রসূত নয়। অস্ট্রেলিয়ার মতো কল্যাণ রাষ্ট্রে বয়সী মানুষ যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণপোষণের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা আছে। এই মায়ের ছেলে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক তাই তিনি এদেশের পিআর তথা পারমানেন্ট রেসিডেন্টের মর্যাদা নিয়েই আসবেন। পিআরদের এদেশে মেডিকেলের বদৌলতে ফ্রী ডাক্তার এবং সরকারী হাসপাতালে ফ্রী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আছে। এদেশের পরিবেশের পাশাপাশি খাবার যেমন ভেজালমুক্ত তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এসব সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের সমাজের বাসিন্দা বয়স্ক মানুষজনের অভিবাসন নানা কারণে সহজ নয়।

কারণ এই বয়সের মানুষজনের দেশের নাড়ির টান সহজে উপড়ে ফেলার নয়। আর এখানকার ব্যবহারিক জীবনটিও বেশ কঠিন। বাংলাদেশের বাসাবাড়িতে যে বুয়া কালচার প্রচলিত, ঘরের রান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা থেকে শুরু করে পরিবারগুলো যেভাবে কাজের লোকজনের ওপর নির্ভরশীল, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে তা সম্ভব নয়। এখানে রান্না থেকে শুরু করে গৃহস্থালির সব কাজকর্ম নিজেদের করতে হয়। মনে করুন এখানকার একজন গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, চিকিৎসক বা প্রকৌশলী। তাঁর জন্যও এখানে কোথাও কোন পিয়ন বা ড্রাইভারের ব্যবস্থা নেই। তাঁর সব কাজ যেমন তাঁকে নিজের করতে হয়, নিজেই ড্রাইভ করতে হয় গাড়ি। নিজের বাজার-সদাই থেকে শুরু করে রান্না, ঘরদোর সাফসুতরো রাখার সব কাজ নিজেই করতে হয়। আমাদের দেশের বাবা-মা বা পরিবারের মুরবিবরা এর সব কাজে অভ্যস্ত নন। একজন মা হয়ত ঘরে রান্নাবান্না করেন। কিন্তু ঘরদোর সাফসুতরো রাখা থেকে শুরু করে আরও অনেক কাজের জন্য বাড়িতে বাড়তি লোক থাকে। অথবা একজন বয়স্ক মানুষ আমাদের দেশে পরিবারের ছোট সদস্য, নাতিনাতনীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। এদেশে তেমন সুযোগ অব্যাহত নয়। কর্মজীবী বাবা-মা এখানে সহজে বাচ্চা নিতে চান না। এমন পরিবারের ছেলেপুলে বড় হয়ে গেলে সকালে উঠে এরা ক্লাস বা কাজের দিকে ছোটে। ঘরে তখন বয়সী দাদা-দাদি বা নানা-নানিকে একাকী নিঃসঙ্গ কাটাতে হয়। তাই আমাদের সামাজিক, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের বাবা-মা বা পরিবারের বয়স্ক সদস্য এখানে বেড়াতে বা চিকিৎসা উপলক্ষে আসতে পারেন। স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আসার সিদ্ধান্তটি খুব সুবিবেচনার হবার নয়।

fazlulbari2007@yahoo.com